প্রবন্ধ রচনা

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. প্রবন্ধ রচনা ও তার শ্রেণী সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

২. নিজ বক্তব্য সুশৃঙ্খল ও বিস্তৃতভাবে লিখতে পারবেন।

৩. মর্মার্থ ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রবন্ধ রচনার কৌশল নির্ণয় করতে পারবেন।

প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম শাখা। কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে লেখক কোনো বিষয় সম্বন্ধে সচেতনভাবে যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাকেই প্রবন্ধ বলে।

'প্রবন্ধ' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। এর উৎপত্তিগত অর্থ প্রকৃষ্ট বন্ধন। বর্তমানে কেবল গদ্যে রচিত ভাব, কল্পনা আর তথ্য সমৃদ্ধ মননশীল রচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে। প্রবন্ধ রচনার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস আর লাগামহীন চিন্তার কোনো সুযোগ নেই। উচ্চারণ, ভাব ও ভাষা- এই তিনটিই প্রবন্ধের প্রাণ। প্রত্যেক প্রবন্ধে কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। যথার্থ তথ্য প্রমাণ, যুক্তি, নিরাবেগ ভাষা আর সংযত চিন্তার প্রয়োগে সেই প্রতিপাদ্য বিষয়কে রূপায়ণ করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

যে কোনো বিষয় নিয়ে বিস্তৃত অথচ পরিমিত আলোচনা অপূর্ব রচনাশৈলী আর ভাষাগত দক্ষতার নিপুণভাবে বর্ণনা করাই হল প্রবন্ধ।

প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ

প্রবন্ধকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ।

২. মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

যে প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকে তাকে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় প্রবন্ধ বলে। লেখকের পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের গভীরতা ও অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা এ জাতীয় প্রবন্ধে প্রকাশ পায়। মূলত বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধই প্রবন্ধ নামে পরিচিত। অপরদিকে লেখক ব্যক্তিগত প্রবন্ধে হাস্যরস ও আনন্দ উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায় :

১. বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ (কাহিনীর বিবরণ বিস্তৃত থাকে)।

২. ব্যাখ্যামূলক (মত ও তত্ত্ব আলোচনা এই প্রবন্ধের আসল উদ্দেশ্য)।

৩. বর্ণনামূলক (বিষয়বস্তুর বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়ে থাকে)।

৪. বিতর্কমূলক (মতবাদের বিশ্লেষণ এবং পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি)।

৫. চিন্তামূলক (বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়ের পরিচিতি নির্ণয়)।

৬. তথ্যমূলক (বিবিধ তথ্যের মাধ্যমে রচিত প্রবন্ধ)।

৭. নীতি কথামূলক (প্রচলিত নীতিকথা এতে স্থান পায়)।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয়

১. মূল বক্তব্য স্থির করে উপকরণ, তথ্যাদি ও সংকেতসূত্র প্রস্তুত।

২. প্রবন্ধের তিনটি অংশ। সূচনায় বিষয়বস্তুর আভাস, মূল বক্তব্যে পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত এবং উপসংহারে থাকবে সিদ্ধান্ত।

৩. এক একটি ভাব অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সন্নিবেশিত করে সহজ, সরল ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হবে। প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটা শিরোনাম থাকবে।

৪. অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য পরিত্যাগ করতে হবে।

৫. রচনার শুরুতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো লিখতে হবে।

৬. বিষয়ওয়ারি যুক্তি ও তথ্যের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। পরস্পর বিরোধী যুক্তি ও ভাব রচনায় স্থান পাবে না।

৭. সাধু ও চলিত ভাষায় মিশ্রণ পরিত্যাগ করতে হবে। কঠিন, দুর্বোধ্য শব্দ, দীর্ঘ ও সমাসযুক্ত পদ এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮. প্রবন্ধ খুব বেশি বড় বা ছোট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বক্তব্য পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেয়া দরকার।

বৈশিষ্ট্য

প্রবন্ধের চারটি বৈশিষ্ট্য : সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, গঠনভঙ্গির ঐক্য, চিন্তার স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের যথাযথ বিন্যাস যাতে রচনায় বহাল থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রবন্ধের নমুনা

১. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস;

২. বাংলা নববর্ষ;

৩. সময়ের মূল্য;

৪. আমার প্রিয় কবি;

৫. বাংলাদেশের পাখি;

৬. এসো দেশ গড়ি;

৭. বৃক্ষরোপন অভিযান;

৮. তোমার প্রিয় উপন্যাস;

৯. বই মেলা;

১০.পরিবেশ দূষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১. ‘প্রবন্ধ’ শব্দের উৎপত্তি -

ক. বাংলা থেকে   খ. সংস্কৃত থেকে

২. বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ হবে -

ক. পাণ্ডিত্যপূর্ণ   খ. হালকা মেজাজের

৩. ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অপর নাম

ক. তন্ময় প্রবন্ধ   খ. মন্ময় প্রবন্ধ

৪. বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ কয়টি উপবিভাগে ভাগ করা যায়

ক. চারটি   খ. তিনটি

গ. সাতটি   ঘ. আটটি

৫. প্রবন্ধের কলেবর হবে -

ক. খুব বড়   খ. খুব

গ. মাঝামাঝি   ঘ. খুব বড়ও না খুব ছোটও না

৬. প্রবন্ধের ভাষা -

ক. বিষয়ের অনুসারী হবে   খ. বিষয়ের অনুসারী হবে না

৭. প্রবন্ধের মোট অংশ -

ক. দশটি   খ. আটটি

গ. তিনটি   ঘ. ছয়টি

৮. গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো লিখতে হবে -

ক. প্রথম দিকে   খ. শেষ দিকে

৯. প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কয়টি -

ক. আটটি   খ. চারটি

গ. নয়টি   ঘ. দশটি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. খ   ২. ক   ৩. খ   ৪. গ   ৫. ঘ   ৬. ক   ৭. গ   ৮. ক   ৯. খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রবন্ধ কাকে বলে? প্রবন্ধে ভাব ও ভাষার ভূমিকা কী?

২. বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ কাকে বলে? বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকে কয়টি উপবিভাগে ভাগ করা যায়?

৩. প্রবন্ধ রচনার লিখন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৪. প্রবন্ধের চারটি বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রবন্ধ

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

ভূমিকা : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। বলা যেতে পারে বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিজ্ঞান ছাড়া বর্তমান দিনে এক পা ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা : প্রাচীনকালে মানুষ ছিল প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাদের জীবন ছিল আটপৌরে প্রাচীন ধাঁচে গড়া। দিন দিন মানুষ সভ্যতাকে জয় করল। অসীম মেধা আর জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অধিকার করল নিত্য-নতুন কৌশল। এক সময় যা একান্তই ছিল অবাস্তব, কল্পনার অতীত, তাই পরিণত হল স্বপ্নে। লেখকরা যা বহু আগে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন বইয়ের পাতায়, মানুষ তার বিবেক বুদ্ধি দিয়ে একদিন তা কব্জা করল অভাবনীয় সাফল্যে। এভাবে নিত্য-নতুন গবেষণা আর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে শাসন করছে বিশ্বকে। প্রয়োজনে ভৃত্যের মতো সে বিজ্ঞানকে হুকুম করছে, খাটাচ্ছে। মোট কথা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের যতটুকু অগ্রগতি, সাফল্য, সবই বিজ্ঞানের অবদান।

বিজ্ঞানের অবদান : দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞান মিশে আছে আঙ্গাঙ্গিভাবে। মানুষ আজ যা কিছু ভোগ করছে তার বেশিরভাগই বিজ্ঞানের উপহার। বিদ্যুৎ দিয়ে আবিষ্কার হয়েছে বিজলি বাতি। ব্যবহার হচ্ছে বৈদ্যুতিক পাখা, টিভি, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার, ওয়াশিং মেশিন, ইস্ত্রি, ওয়াটার পাম্প, ইলেকট্রিক কুকার, হিটার ইত্যাদি কত কি। টেলিফোন, ঘড়ি, গ্যাস, সেভিং মেশিন, পোশাক, খাদ্য ইত্যাদি যাবতীয় ভোগ্য পণ্য আমাদের হাতের নাগালে না থাকলে জীবন অচল হয়ে পড়ে। ঘর থেকে বের হলেই সাইকেল, মোটর গাড়ি, রেল, বিমান, লিফট, ফ্যাক্স, টেলিগ্রাম, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টাইপ মেশিন, ফটোকপিয়ার, ইন্টারনেট প্রভৃতি আমূল বদলে দিয়েছে আমাদের জীবন প্রণালীকে। সংবাদপত্র নানা দেশের টাটকা খবর প্রতিদিন পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের দোরগোড়ায়। আনন্দ ও জ্ঞানের উপকরণ নিয়ে টেলিভিশন এসেছে সবার গৃহকোণে। বিশ্বের অপর প্রান্তের খবর মুহূর্তেই ভেসে আসছে টেলিভিশনের পর্দায়। সেলুলার টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে বিস্ময়কর বিপ্লব। অপরদিকে বইপত্র আমাদের জ্ঞানের পরিধিই কেবল বাড়ায়নি, বিনোদনের খোরাকও জোগাচ্ছে প্রচুর। এছাড়া, নানারকম দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা সম্ভবপর হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। আবিষ্কার হয়েছে নতুন নতুন ওষুধ আর যন্ত্রপাতি। এর ফলে বহু রোগ-যন্ত্রণা আর দুঃখ-বেদনা থেকে নিরাময় পেয়েছে রোগীরা। উপশম হয়েছে চরম যন্ত্রণাময় অভিশপ্ত জীবনের।

বিজ্ঞানের প্রভাব : বিশ্বময় মানুষ আজ জ্ঞানচর্চা আর বিদ্যার্জনের নেশায় মেতে উঠেছে। আমাদের আরাম-আয়েশ আর প্রয়োজনের জন্য যা যা দরকার সবই করেছে বিজ্ঞান। চাষাবাদ থেকে শুরু করে শিল্প, কল-কারখানা, খাদ্য, প্রসাধন, ভোগ্য পণ্য সবই আমরা গ্রহণ করেছি বিজ্ঞান থেকে। বিজ্ঞান মানুষের মন থেকে হটিয়ে দিয়েছে অন্ধ কুসংস্কার। তৈরি করেছে মুক্ত চিন্তার আলোকিত মানুষ।

উপসংহার : আমাদের প্রতিদিনের কর্মে, চিন্তায়, বিশ্বাসে যতই আমরা বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরতে পারব, ততই আমরা এগিয়ে যাব সামনের দিকে। বিজ্ঞানই কেবল আমাদের পর্বত-পরিমাণ অজ্ঞতা দূর করে অগ্রসর জীবনের দিকে এগিয়ে দিতে পারে।

ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা : অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের তপস্যা। এই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে গভীর সাধনার প্রয়োজন। ছাত্রজীবন হল কর্মজীবনের প্রস্তুতিকাল। ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে ছাত্রজীবনের প্রস্তুতির উপর। এই সময় যে যেমন বীজ বপন করবে সে তেমনি ফল ভোগ করবে। যে কারণে এই সময়টা হেলাফেলায় নষ্ট না করে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য : ছাত্রসমাজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। যোগ্যতর নাগরিক হিসেবে তারা ভবিষ্যতে দেশ ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে পালন করবে নেতৃত্বের ভূমিকা। ছাত্রসমাজের অন্যতম

কর্তব্য হল শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত স্বচ্ছল সমৃদ্ধ একটি নির্মল সমাজ গঠন করা। ছেলেবেলা থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি নিতে হবে। এ জন্য তাদের হতে হবে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত, অটুট স্বাস্থ্য ও নির্ভীক সাহসের অধিকারী। আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হলে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও, আত্মোন্নয়ন ও গঠনমূলক পুস্তকাদি নিয়মিত পাঠ করা দরকার। একজন ছাত্রকে অবশ্য স্বাবলম্বী, ন্যায় পরায়ণ, পিতামাতার আজ্ঞাবহ, সেবাপরায়ণ ও ধৈর্যগুণের অধিকারী হতে হবে।

ভবিষ্যৎ-পদক্ষেপ : বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে হারে দুর্নীতি, অবক্ষয়, সন্ত্রাস, রাহাজানি আর মানবিক মূল্যবোধের পতন ঘটেছে তা মোকাবেলার জন্য আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। ইদানীং ছাত্রদের ভেতর নকল করার যে প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা প্রতিরোধের মাধ্যমে সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে তরুণ প্রজন্মের মানসিক পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

উপসংহার : ছাত্রজীবন হল জীবন গড়ার সময়। আত্মোন্নতির পাশাপাশি সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধনই তার প্রধান ব্রত হওয়া উচিত। একজন ছাত্র এই লক্ষ্য নিয়ে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে সাফল্যের গৌরব মুকুট তার আয়ত্তে আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

ভূমিকা : শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের নাগরিক। এই শিশুদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ওপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। অথচ আমাদের শিশুদের বড় একটি অংশ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত। আজকের শিশুরা যদি যথার্থ শিক্ষা না পায় তা সমাজের জন্য এক কালো অধ্যায় ডেকে আনবে। আগামীতে নিরক্ষরতার কবলে নিমজ্জিত হবে গোটা দেশ। তাই কোনো শিশু যাতে দারিদ্র্য বা অন্য পারিপার্শ্বিক সমস্যার কারণে স্কুল থেকে নাম প্রত্যাহার করে না নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে কঠোরভাবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে গেলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা একান্তই অপরিহার্য।

কর্মসূচি গ্রহণ : বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৪১ হাজার। এই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প হলেও নেহায়েত কম নয়। কেবল স্কুলের সংখ্যা বাড়লেই যে শিক্ষার হার বাড়বে এমন কথা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী প্রায় ৩০ ভাগ ছেলেমেয়ে কোনো স্কুলে যায় না। যারাও বা কোনোভাবে নামটা স্কুলে টিকিয়ে রেখেছে তাদের একটি বড় অংশ তৃতীয় শ্রেণীতে ওঠার আগেই কেটে পড়ে। যে ৭০ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয় তাদের সংখ্যা ৯০ লক্ষ। এদের মধ্যে ২২ লক্ষ শিশু বিভিন্ন শ্রেণী থেকে লেখাপড়া গুটিয়ে চলে যায় স্কুল ছেড়ে। বলতে গেলে এদের পুরোটা প্রায় নিরক্ষর থেকে যায়। ফলে এরা জাতির জন্য সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে চেপে বসছে সমাজের বুকে। এজন্য ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলে যায় সে ব্যাপারে বাবা মাকে সচেতন করতে হবে। উপরন্তু খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি জোরদার করার পাশাপাশি শিক্ষা সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এ লক্ষে লেখাপড়ার পাশাপাশি উপার্জনের ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য অবৈতনিক নৈশ স্কুল চালু করা দরকার।

পাঠ পরিকল্পনা : বর্তমান সময়ের নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। গাদা-গাদা বই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মাথায় না চাপিয়ে পাঠ্য তালিকা এমন মনোগ্রাহী করে উপস্থাপন করা উচিত যা তাদের আগ্রহী করে তোলে। এ ব্যাপারে প্রয়োজন হলে পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় কাগজে সুশোভনভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া, শিক্ষকদের পাঠ পদ্ধতি আরো অত্যাধুনিক ও আন্তরিকতাপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়।

উপসংহার : প্রাথমিক শিক্ষা হল দেশের আসল ভিত্তি। দেশের জন্য এর চেয়ে বড় বিনিয়োগ আর নেই। আমাদের শিশুরা ভবিষ্যতে যাতে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীতে পরিণত না হয় এ ব্যাপারে সজাগ হতে হবে সবাইকে। সরকার শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

অধ্যবসায়

ভূমিকা : বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় হল সাফল্য লাভের গোপন চাবিকাঠি। প্রতিটি অর্জনের জন্য চাই ক্লান্তিহীন পরিশ্রম আর সাধনা। অধ্যবসায় ব্যতীত সাফল্য লাভের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা তারা সবাই ছিলেন অসাধারণ অধ্যবসায়ী। একমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিরাই জীবনের সবক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, ছিনিয়ে নিয়েছেন গৌরবময় বিজয়ের মুকুট আরোহণ করেছেন খ্যাতি আর সুনামের উচ্চ শিখরে।

অধ্যবসায়ের গুরুত্ব : জীবনের সবক্ষেত্রে রয়েছে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা। মানবজীবনে বাধা বিপত্তি অপরিহার্য। এই বাধাকে অতিক্রমের জন্য চাই অসীম মনোবল। চাই একাগ্র নিষ্ঠা। ব্যর্থতাটা মনে করতে হবে সাফল্যের প্রথম সোপান। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে 'Failure is :he pillar of success' সংসারে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার শক্তি যার বেশি, সাফল্যও তার তত বেশি। পরিশ্রমী, সংগ্রামী ও দৃঢ় চিত্তের ব্যক্তিরাই জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করে থাকে। এই সংসারে যত মহাকীর্তির স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূলে আছে মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অধ্যবসায়।

প্রতিভা ও অধ্যবসায় : অনেকের ধারণা প্রতিভা ব্যতীত কোনো সাফল্য লাভই সম্ভব নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বহু বিখ্যাত লোক জীবনের প্রথম ধাপে প্রতিভাবান ছিলেন না। ভলতেয়ার বলেছেন, 'প্রতিভা বলে কিছু নেই। পরিশ্রম আর সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।' নিউটনও প্রতিভার চেয়ে অধ্যবসায়কে বড় করে দেখেছেন। অতএব প্রতিভা নয় অধ্যবসায়ই হল জীবনে সাফল্য লাভের মূল মন্ত্র। বার বার ব্যর্থ হবার পর স্কটল্যাণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস যেভাবে বিজয় অর্জন করেন আজও তা একটি বড় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। নেপোলিয়নও তাঁর ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন অধ্যবসায়ের গুণে।

উপসংহার : ছাত্রজীবন থেকে অধ্যবসায়ের দুর্মর আকাঙ্খা মনে লালন করা দরকার। পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ছাড়া পরীক্ষায় যেমন ভাল ফলাফল অর্জন সম্ভব নয়, তেমনি সফল পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়াও বেশ কঠিন। তাই একবার বিফল হলে চলবে না। সকল ব্যর্থতাকে ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নব উদ্যমে। কবি তাই বলেছেন-

"একবার না পারিলে দেখ শতবার
সকলে পারিবে যাহা তুমিও পারিবে তাহা
পারিবে না একথাটি বলিও না আর।"

শ্রমের মর্যাদা

ভূমিকা : পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি। পরিশ্রম ব্যতীত কোনো কিছু লাভ করা যায় না। কর্মই মানুষের চালিকা শক্তি। অফুরন্ত কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হলে মানুষকে তার ভাগ্য গড়ে নিতে হয়। কারণ জীবন ফুলশয্যা নয়। জীবন মানেই সংগ্রাম। এ সংগ্রাম কর্মপ্রতিষ্ঠার, প্রতিপত্তির। কাজেই জীবনে উন্নতি করতে হলে কঠোর পরিশ্রম অপরিহার্য। একজন মনীষী বলেছেন, 'ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে পরিশ্রম দ্বারা যত বেশি পারা যায় কাজে লাগাও।'

শ্রমের মূল্য : ব্যক্তি ও মুষ্টিগত সকল উন্নতির মূলে রয়েছে শ্রম ও অধ্যবসায়। যে জাতি যত পরিশ্রমী সে জাতি তত উন্নত। কার্লাইল শারীরিক পরিশ্রমকে পবিত্র বলে অভিহিত করেছেন। পাশ্চাত্যে যে কোনো শ্রমকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। জগতে যে সব মনীষী মহাপুরুষ কর্মের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন করেছেন তারা সবাই ছিলেন পরিশ্রমী। পৃথিবীতে যে সব অমর কীর্তি স্থাপিত হয়েছে তার পেছনে রয়েছে মানুষের গভীর শ্রম ও অধ্যবসায়।

শ্রমের মর্যাদা : শ্রম হল মানুষের গৌরব ও মর্যাদার বস্তু। পাশ্চাত্যে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পেলেও আমাদের দেশে এ সম্পর্কে রয়েছে প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা। গরিব দেশের মানুষ হয়েও কায়িক পরিশ্রমকে এদেশে অত্যন্ত হেয় চোখে দেখা হয়।

অথচ দেশে বেকার সমস্যা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। দৈহিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বহু লোক কর্মহীন বসে আছে হাত পা গুটিয়ে। শ্রমের প্রতি এদেশের মানুষের এরকম নৈতিক মনোভাব অবশ্যই পাল্টাতে হবে। প্রতিটি নর-নারীর হাতকে পরিণত করতে হবে কর্মীর হাতিয়ার হিসেবে। কেননা হাতে কাজ করা অগৌরবের নয়, অগৌরব হয় মিথ্যা, মূর্খতা, নীচতায়। কারো শ্রমের মর্যাদা কম নয়। শ্রমকে গৌরবময় করতে হলে শ্রমিককে মর্যাদা দিতে হবে সবার আগে।

শ্রমের মূল্যায়ন : পরিশ্রম ছাড়া নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। কর্মহীন মানুষ সমাজ ও দেশের জন্য বোঝার সামিল। বিশ্বের বহু দেশ ধ্বংসাবস্থা থেকে শুধু পরিশ্রম করে নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে। অন্যান্য জাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদেরও কায়িক শ্রমের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠত করতে হবে।

উপসংহার : ঠুনকো আভিজাত্য আর মিথ্যা অহংকারে ডুবে না থেকে পরিশ্রমকে যত দ্রুত আমাদের কর্মে, চিন্তায় ও বিশ্বাসে মর্যাদার বস্তুতে পরিণত করা যায় ততই মঙ্গল।

পরিবেশ দূষণ

ভূমিকা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রযাত্রা সমাজের জন্য যেমন মঙ্গল বয়ে এনেছে অপরদিকে তা মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাটি, পানি ও বায়ুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে মানুষ যে ধ্বংস ডেকে আনছে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে নিষ্ঠুর হাতে। বিশ্ব পরিবেশ বিষাক্ত হবার কারণে গোটা জীব-জগতের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

পরিবেশ দূষণের কারণ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির ওপর মানুষের চাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বন কেটে বসত করতে গিয়ে বনজ সম্পদ আজ উজাড় হবার পথে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উদ্ভিদ আর প্রাণিজগত। মানুষের নিক্ষিপ্ত আবর্জনা ও অপব্যবহারের ফলে পানি দূষণ ঘটেছে ব্যাপক হারে। এছাড়া, শক্তি উৎপাদনের সাথে নির্গত হয় মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের নানা উপকরণ। একইভাবে সীসা, পারদ, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে ঘটছে মারাত্মক বায়ু দূষণ। গাড়ি থেকে নির্গত পেট্রোল আর গ্যাসের কালো ধোঁয়া, শব্দ এই দূষণের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এর হাত থেকে সহজে নিস্তার নেই। মাথা ধরা, শ্বাস কষ্ট, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, ফুসফুস ক্যান্সারসহ নানা জটিল রোগ এ জাতীয় দূষণের অন্যতম কারণ।

কৃত্রিম ও পারিপার্শ্বিক দূষণ : কৃত্রিম দূষণ যেমন- কীটনাশক, সার, গুঁড়ো সাবান, প্রসাধন সামগ্রি ও প্লাস্টিকের উপকরণাদিসহ কলকারখানার বর্জ্য পরিবেশকে নরক করে তুলেছে। এছাড়া, নিত্যদিন মানুষের নিক্ষিপ্ত ময়লা-আবর্জনা এই সংকটকে আরো উসকে দিয়েছে। ময়লা-আবর্জনা থেকে সৃষ্ট দূষণের ফলে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রামক, হাঁপানি, কাশি ও ক্যান্সারের মতো জটিল রোগ তৈরি হতে পারে। অপরদিকে দূষিত পানি-বাহিত রোগ যেমন জণ্ডিস, ডায়রিয়া, রক্ত আমাশয়, কলেরা ও কৃমিজাত রোগের বিস্তার ঘটছে আশংকাজনক হারে।

পরিবেশ দূষণের প্রভাব : এটম বোমা নিক্ষেপে হিরোশিমা নাগাশাকিতে যে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল তার মাশুল এখনও গুনে চলেছে সেখানের মানুষ। একইভাবে ভূপাল ও চেরানোবিলে যে মারাত্মক তেজোস্ক্রিয় দূষণ ঘটেছিল তাতে ব্যাপক প্রাণহানি শুধু ঘটেনি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হয়েছিল ব্যাপকভাবে। ভিয়েতনামে নিক্ষিপ্ত নাপাম বোমার প্রতিক্রিয়ায় এখনও জন্ম নিচ্ছে বহু বিকলাঙ্গ শিশু। এছাড়া, পারমাণবিক যুদ্ধ ও অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই বিশ্ব ক্রমাগত মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

শব্দ দূষণ : আমাদের দেশে শব্দ দূষণের ঘটনাটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যানবাহনের বিকট শব্দ, কলকারখানার যান্ত্রিক আওয়াজ, মাইকের চিৎকার প্রভৃতি সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। শব্দ দূষণের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এর ফলে মানসিক বিপর্যয়, রক্তচাপ, স্নায়ুর অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

উপসংহার : পরিবেশ দূষণের ফলে বিশ্ব আজ আতঙ্কগ্রস্ত। এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে প্রকৃতি ও প্রাণিজগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। আমাদের সামগ্রিক চেষ্টায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

ভূমিকা : সন্তানের কাছে পিতামাতার স্থান অনেক উঁচুতে। সংস্কৃতিতে বহুল প্রচলিত একটা উক্তি আছে- 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' হাদিস শরীফে বলা হয়েছে - 'জননীর পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত'। পৃথিবীর সব ধর্মে বা নীতি শাস্ত্রে পিতামাতার স্তুতি ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মাতাপিতার তুল্য গুরুজন আর কেউ নেই। তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য।

পিতামাতার স্থান : সন্তানের কাছে স্রষ্টার পরেই পিতামাতার আসন। মা অতি কষ্টে দশ মাস সন্তানকে নিজ গর্ভে ধারণ করেন। ভূমিষ্ঠ হবার পরও মায়ের কোলই হয়ে ওঠে সন্তানের বড় আশ্রয়স্থল। শত বিপদে-আপদেও বাবা-মা অতি যত্নে সন্তানকে লালন-পালন করেন। রোগে, শোকে, বিপদে আগলে রাখেন প্রিয় সন্তানকে। তাদের থাকা-খাওয়া, লেখাপড়া, পোশাক, চিকিৎসা ইত্যাদি সব দায়িত্বই মাথায় তুলে নেন বাবা-মা। সন্তানের মঙ্গল কামনায় অনেকেই জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। সম্রাট বাবর পুত্র হুমায়ুনের জীবন রক্ষার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা বর্তমান যুগে খুবই বিরল ঘটনা। এমন পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য : সন্তান যতই বড় হোক না কেন পিতামাতার কাছে সে ছেলেবেলার ছোট্ট সন্তান মাত্র। বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মা যখন অসুস্থ কিংবা অচল হয়ে পড়েন তখন সন্তানের উচিত বাবা-মার যথার্থ যত্ন ও সেবা করা। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন তারা সবাই পিতামাতার ভক্ত ছিলেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্দুল কাদের জিলানি, আলেকজাণ্ডার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির নমুনা আজও চির অমলিন হয়ে আছে।

উপসংহার : পিতামাতার প্রতি আনুগত্য সন্তানের চরিত্রকে মহীয়ান করে তোলে। যে পিতামাতার কারণে সন্তান পৃথিবীর রূপ, রস, সৌন্দর্য উপভোগ করছে, তার চেয়ে আপনজন আর কেউ হতে পারে না। যে কারণে একজন আদর্শ সন্তান হিসেবে পিতামাতার আদেশ-নির্দেশ পালন করা একান্ত কর্তব্য। এছাড়া, তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি কটু ও কর্কশ ব্যবহার পরিহার করা উচিত। আজকের সন্তান ভবিষ্যতে একদিন পিতা-মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন - এই সত্যটি সবসময় মনে রাখা দরকার।

সংবাদপত্র

ভূমিকা : বর্তমান যুগে সংবাদপত্র জীবনের এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার আর দশটা উপাদানের মতো সংবাদপত্রও জীবনের বড় এক অবলম্বন। দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদপত্র হল সারা বিশ্বের দর্পণ স্বরূপ। বিশাল পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়েছে সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের উৎপত্তি : সর্বপ্রথম ভেনাসে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। একাদশ শতাব্দীতে চীনেও এক ধরনের সংবাদপত্র মুদ্রিত হত। খ্রিস্টান মিশনারিরা, বাংলা ভাষায় যে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন তার নাম সমাচার দর্পণ। এদেশে সবচেয়ে পুরানো দৈনিকের নাম আজাদ। বর্তমানে দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক। রাজধানী ছাড়াও বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকেও এখন নিয়মিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা : সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংবাদ, প্রতিবেদন, মন্তব্য ও নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয় বলেই বিচিত্র স্বাদ লাভ করা যায়। এতে জ্ঞান আহরণের পথ প্রশস্ত হয়। আগে বিশ্ব পরিভ্রমণ করে মানুষ যে জ্ঞান সঞ্চয় করত আজ অনায়াসে ঘরে বসেই তা চলে আসছে হাতের মুঠোয়। রাজনীতি, খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার, টেলিভিশন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, বাজারদর ও শেয়ার মার্কেট ছাড়াও নানা ধরনের দেশী-বিদেশী খবরে ঠাসা থাকে বলেই সব শ্রেণীর পাঠকেরা কৌতূহল নিবৃত্তি করে থাকে।

সংবাদপত্রের প্রভাব : দেশ-বিদেশের সংবাদ সংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, নিজস্ব উদ্যোগেও স্থানীয়ভাবে সংবাদাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। জাতীয় জীবনে এইসব সংবাদের প্রভাব অসীম। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার মতামত প্রকাশ করা। সমাজ সংস্কার, সমাজ সেবা ও জনমত গঠনে সংবাদ-পত্রের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। সরকারের সঙ্গে জনগণের সংযোগ সাধন করে সংবাদপত্র। অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের

জন্যে বিতর্কিত হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের ভূমিকা। এই ধরনের প্রবণতা হলুদ সাংবাদিকতার নামান্তর। দেশ ও জাতির পক্ষে এটা বিপজ্জনকও বটে।

উপসংহার : সংবাদপত্র জনগণের সেবক। বিভিন্ন মত ও রুচির জনমত গঠনের জন্য এর গুরুত্ব অসীম। যে কোনো সভ্য দেশে সংবাদপত্র আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এর মাধ্যমে জনগণ সঠিক পথে চলার নির্দেশ খুঁজে পেতে পারে।

সময়ের মূল্য

ভূমিকা : সময়কে স্রোতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেননা সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। জীবনে সময়ের মূল্য অনেক। যারা সময়কে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করতে পারে তাদের জীবন পরিপূর্ণ ও সফল হয়ে ওঠে। এজন্য বলা হয় : 'Time is gold. You utilise :ime, it will give you gold.'

সময়ের মূল্য : মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার গৌরব চিরস্থায়ী। জীবন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এই মূল্যবান সময়টুকু আমরা যেন হেলায় নষ্ট না করি। এ ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই সজাগ হওয়া দরকার। ভবিষ্যতের জন্য কোনো কাজ তুলে না রেখে প্রতিদিনের কাজ রুটিন মাফিক শেষ করতে হবে। কিন্তু অনেকেই সময় সচেতন নয় বলেই সময়ের যথাযথ ব্যবহার জানে না। অনেক মূল্যবান সময় অকারণে হেসে খেলে উড়িয়ে দেয়। অথচ পাশ্চাত্যের জনগণ সময় সম্পর্কে অধিকতর সচেতন বলেই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে অভাবনীয় সাফল্যের অধিকারী হতে পেরেছে।

সময়ের সদ্ব্যবহার : মানুষের জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের সমষ্টি। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে একজন মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। সমাজের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশ ও দশের জন্য কিছু করাই একজন মানুষের বড় স্বপ্ন। কিন্তু এই কাজগুলো সময় মতো না করতে পারলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অনেক সাধারণ মানুষ সময়ের সদ্ব্যবহার করে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আবার অনেক প্রতিভাবানও হেলাফেলায় সময়কে নষ্ট করে জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই সময় ফুরোবার আগে সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা উচিত।

সময় সচেতনতা : আমাদের দেশের লোকজন কর্তব্যকর্মে যেমন উদাসীন সময়ের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। জীবনের প্রতি পদে তারা ঢিলেঢালা ভাবে চলতে অভ্যস্ত। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা একেবারেই নেই। এই সময় সচেতনতার অভাবে ব্যক্তির যেমন উন্নতি ঘটছে না, দেশও তেমনি বঞ্চিত হচ্ছে তাদের প্রকৃত সেবা থেকে। আসলে সময়কে ফাঁকি দেবার অর্থই হল নিজেকে ফাঁকি দেয়া। অনেক ক্ষতির মধ্য দিয়ে এর মাশুল আমাদের গুনতে হচ্ছে কড়ায়গণ্ডায়।

উপসংহার : জীবন সংগ্রামে যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন সময় সচেতন। মনীষীদের জীবন পাঠ করলে এই সত্য সহজে অনুধাবন করতে পারি। সময়ের মূল্য দিয়েই তাঁরা জীবনকে প্রাচুর্যময় করেছেন। অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ভবিষ্যতের মানুষের জন্য। আমরাও যেন সময়ের হাত ধরে সেই আলোর পথের দিশারী হতে পারি সেই লক্ষে এগিয়ে যেতে হবে।

বইমেলা

ভূমিকা : বইয়ের মতো বড় বন্ধু আর নেই। বই কিনে কেউ কখনও দেউলে হয় না। অথচ বই কেনার রেওয়াজ আজও আমাদের এখানে তেমনভাবে চালু হয়নি। এর পেছনে কারণও আছে যথেষ্ট। ছাত্রজীবনে বইয়ের সঙ্গে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে পরবর্তী কালে কর্মজীবনে এসে তা অনেকটা আলগা হয়ে যায়। বলতে গেলে এভাবে অলক্ষ্যেই একজন পাঠকের মৃত্যু ঘটে। বইয়ের সঙ্গে পাঠকের এই যোগাযোগহীনতার কারণে পাঠকের মেধা ও মননের বিকাশ ঘটে না। বই মানুষের চেতনা ও শক্তিকে জাগ্রত করে, আলোকিত করে- বই মেলা পাঠকের নাগালের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের নতুন নতুন বই পৌঁছে দিয়ে জ্ঞানের প্রবাহকে সচল রাখে।

বই মেলার সূচনা : ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দে বই মেলার সূচনা হয় জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে। লিপজিগ হচ্ছে বই মেলার প্রাচীনতম স্থান। ফ্রাংকফুর্টে বসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বইমেলা। বিশ্বের অন্যান্য বড় শহরে এখন নিয়মিতভাবে বই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে প্রথম ঢাকায় বই মেলা আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে

একুশের বই মেলা বসছে। ঢাকা বই মেলার উদ্যোক্তা জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। এছাড়া প্রকাশনা সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দেশের আনাচে কানাচে বইমেলা আয়োজন অনেকটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

বই মেলার আয়োজন : বড় ধরনের বই মেলার জন্য খোলা ময়দানই উপযুক্ত জায়গা। এখানে প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্তোরাঁ, শিশু কর্নার, লেখককুঞ্জ, সেমিনারসহ আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ছোট পরিসরের মেলাগুলো বেশিরভাগই হয়ে থাকে অভ্যন্তরীণ পরিবেশে। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নতুন বইয়ের সম্ভার নিয়ে স্টল খোলে বই মেলায়। এক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা থাকে বিশেষ ধরনের বই প্রকাশের। ফলে ক্রেতারা তাদের অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী বই কিনতে পারেন।

বইমেলা ও পাঠক : বইমেলার মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ হয় বলে প্রকাশক ও ক্রেতার মধ্যে একটা যোগসুত্র তৈরি হয়। বইমেলা হয়ে ওঠে লেখক, প্রকাশক, শিল্পী ও পাঠকের মিলন-মেলা। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময়ের ফলে তাদের ভেতর সৌহার্দ্য সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। মেলায় ঘুরে ঘুরে বই কেনা, আড্ডা, বিতর্ক, আলোচনা, গান-বাজনা, আবৃত্তি - সব মিলিয়ে একটা আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হয়। অনেক সময় টিকেট কেটে মেলায় প্রবেশ করতে হয় বলে অবাঞ্ছিত লোকদের ভিড় কম থাকে। তাছাড়া মেলায় বিশেষ কমিশনে বই বিক্রি হয় বলে পাঠক নতুন বই কিনতে আগ্রহ বোধ করেন।

উপসংহার : বই মেলার বড় বৈশিষ্ট্য হল পাঠক মেলায় এসে হরেক রকম নতুন বই দেখার সুযোগ পান। এর ফলে তাদের পাঠ স্পৃহার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। এভাবে সাধারণ জনগণকে বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের জগতে এক ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে বই মেলা। এর সুফল লেখক, প্রকাশক, পাঠক - সবাই সমানভাবে ভোগ করছেন।